OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 297 - 305
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'মহানদী' : মহানদী অববাহিকার প্রান্তিক জনজীবনের এক মরমী উপাখ্যান

বিজয় কুমার স্বর্ণকার
কলেজপাড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর
Email ID: bijoyswarnakar2014@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Anita Agnihotri, Mahanadi, kilometer long Mahanadi, people of the Mahanadi basin.

Abstract
Anita Agnihotri's recent book 'Mahanadi' is a popular novel. Although the novel Mahanadi is river-centric, it is also a novel of social realism ethos. Novelist Agnihotri is a wander lust-loving passion. To satisfy this thirst, she has traveled to various pilgrimage sites, rivers, mountains, dense forests and jungles in India, She has enriched her bag of experiences by traveling to various places in the country and abroad. She has repeatedly traveled along the 858 - kilometer long Mahanadi, from it source at the foot of the Sihaws mountain in Dhamtari district of Chhattisgarh to its mouth near Jagatsingpur in Cuttack district of Orisha, and has gained diverse experiences. In this regard, the writer Anita Agnihotri says— "For many years, I have traveled around the Mahanadi basin. Not continuously, but repeatedly, in isolation. I have been the companion of so many people's families, I have sat at the invitation of so many houses. While resting on the side of the road, I have found lost folk songs and rural history." ('Amar katha', page-9)

Anita Agnihotri begins the novel 'Mahanadi' by describing the amazing beauty of the spring forest nature of the Mahanadi basin. But in 'Mahanadi' the story is not only about the river, the course of the river, the natural scenery of the mountains and dense forests on the banks of the river, But ultimately the story of the poor and marginal people of the Mahanadi basin. Admitting this, Anita says— "I have a bias towards marginal people…This story is ultimately not about the river, but about the people." ('Amar katha', page-9)

Anita Agnihotri's has dedicated the novel 'Mahanadi' to the people of the Mahanadi basin. Therefore, it is natural that she will highlight the happiness and sorrow of the marginalized people of the vast area of the Mahanadi basin and their struggle for life. Due to the attraction of this Mahanadi and its water, farmers, weavers, artisans, tribal tribes, keot-dhivars, blacksmiths, sahu, nagarchi, misad, yadavs, satnami or barbers and other tribal and non-tribal communities have settled here. And the Mahanadi is inextricably linked to the lives and livelihood of all these classes of people. But since the construction of the Hirakuddha Dam or Reservoir in the Jamda

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

coastal region near Sambalpur, the suffering of the poor and marginalized people of about two hundred villages have known no bounds. Due to the conspiracy of political leaders for personal interests and fake promises, the poor professions in the past, who were somehow surviving, have all disappeared. The addresses of many people suddenly changed. The pictures of the people who were uprooted from their own birthplace for the Dam, the people who were uprooted and displaced, who were traveling to an unknown destination with their hearts full of sorrow, have been described by Anita Agnihotri such human language that the reader is stunned while reading it.

Moreover, storyteller Anita Agnihotri has created a card to connect us with her by providing a beautiful and relevant description of all the myths, folk-lore, customs, rituals, worship, folk-beliefs, superstitions, vow stories and folk-songs that are inextricably linked to the lives of ordinary marginalized people in the Mahanadi basin region.

This is how writer Anita Agnihotri in her novel 'Mahanadi', tells the story of the continuous degradation of the marginalized lower-class communities living in various regions of the Mahanadi basin due to various reasons, there happiness and sorrow, disappointment, broken dreams, exploitation and deprivation. She portrays it in such touching language that the readers also feel sympathy and compassion for those communities.

Discussion

"সকালের প্রথম আলোয়, বিকেলের ঢলে পড়া সূর্যালোকে, মধ্য দিনের দাহে, সূর্যাস্তের রাঙা ছায়ায় আমি মহানদীকে দেখেছি নানাভাবে। তাকে দেখেছি শীতের শীর্ণ স্রোতে, ঘন বর্ষার মধ্যে, দেখেছি উৎসের জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে, দেখেছি সমুদ্র মোহনার উত্তাল সীমাহীনতায়। প্রতিবারই গম্ভীর, ভয়াল, শান্ত এই নদী মনে জাগিয়েছে বিপুল হর্ষ আর স্মৃতি-কাতরতা। এই নদী উৎসের, অববাহিকার বহু মানুষ আমার চেনা। নদী সম্পৃক্ত তাদের জীবন আমাকে ভাবিয়েছে, মুগ্ধ ও ঋদ্ধ করেছে। এই নদীর কাহিনি তাই আমার জীবনেরও এক নির্যাস।"[১]

'মহানদী' উপন্যাসের 'পূর্ববৃত্ত' অংশে মহানদী অববাহিকা দর্শন-অভিজ্ঞতার কথা এমন সুন্দর কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন কথাশিল্পী অনিতা অগ্নিহোত্রী।

সাম্প্রতিক কালে রচিত অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'মহানদী' (২০১৫) একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মতোই 'মহানদী'ও একটি বিখ্যাত নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। ইংরেজি অনুবাদে অনিতা 'মহানদী'-কে 'the tale of a river' বলেছেন। বিষয়ানুযায়ী 'মহানদী'কে একটি সামাজিক-বাস্তবধর্মী উপন্যাসও বলা যায়। তবে বিষয় থেকেও নদীর প্রবহমানতাই এ উপন্যাসে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। নদীর গতিপথ বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় উভয় পাশ্বের জঙ্গম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বদলে যায় নগর-প্রান্তর-গ্রামজনপদের দৃশ্যপট। নদীর গতির সঙ্গে তাল রেখে এ উপন্যাসে এক প্রবহমান জীবনের ছবি দেখা গেল।

কথাকার অনিতা অত্যন্ত ভ্রমণপিপাসু। এই পিপাসা চরিতার্থের জন্য তিনি ভারতের নানাস্থানে গেছেন। ভ্রমণ করেছেন ভারতের নানা তীর্থস্থানে, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অত্যন্ত ঘন বন-জঙ্গল ও বিপদসঙ্কুল স্থানে। দেশে ও বিদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ সূত্রে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটিকে পরিপূর্ণ করেছেন। উৎসস্থল ছত্তিশগড়ের ধম্তরি জেলার সিহাওয়া পর্বতের পাদদেশ থেকে মোহনা ওড়িশার কটক জেলার জগৎসিংহপুরের কাছে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৮৫৮ কিলোমিটার মহানদী অববাহিকায় বারবার পরিভ্রমণসূত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। মহানদীর এই দীর্ঘ যাত্রাপথের

–

> "কোথাও পর্বত-মণ্ডিত মালভূমি, নিবিড় অরণ্য, কোথাও জনপদ, কোথাও জনমানবহীন শূন্যতা। কোথাও আছে প্যালিওলিথিক (Paleolithic) যুগের চিহ্ন তো কোথাও শোনা যায় প্রাচীন গীতিকাহিনি, মধ্যযুগীয় কাব্যবন্দনা। চাষী, বুনাকার, কারিগর তার জলের জঙ্গমতার টানে এসে বসত করেছে মহানদীকূলে। আবার নদীতে বাঁধ দেওয়ার যজ্ঞে ডুবে গেছে শত শত গ্রাম, উচ্ছিন্ন মানুষ চোখের জলে বেরিয়ে পড়েছে নতুন আশ্রয় খুঁজতে।"[২]

মহানদীর গতিপথ এবং এই নদী-অববাহিকার প্রান্তিক জনপদের যে বাস্তব ও মর্মান্তিক জীবনচিত্র তিনি তুলে ধরলেন তাতেই নিহিত আছে এই 'মহানদী' উপন্যাসের প্রকৃত সারমর্ম।

মহানদী অববাহিকার বসন্তকালীন অরণ্যপ্রকৃতির এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটির গতি সূচনা করলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। লেখকের চোখে আমরাও দেখতে পেলাম, অগ্রহায়ণ-পৌষের দুর্জয় রাত্রিগুলি যেন স্বপ্নময়; ফাল্গুনের দুপুরে রোদের তাপ থাকলেও জ্বালা নেই; অরণ্যের ঝরাপাতার ভেতরে শোনা যায় বাতাস চলার আওয়াজ আর নানা পাখির ডাক। মাইলের পর মাইল বসন্তের পর্ণমোচী অরণ্যের পিঙ্গল, সাদা-কালো গাছেদের এক ঝাপসা দেওয়াল; কোথাও আগুনের শিখার মতো থোকায় থোকায় ফুটন্ত লাল পলাশ ফুল; কোথাও গাঢ় কমলা ফুলের গুচ্ছ; কোথাও ঝরা পাতায় মিশে আছে শালের গুঁড়ো গুঁড়ো ফুল; কোথাও বা বাতাসে ছোটে শাল মহুল মেশা মদির গন্ধ। কখনও দেখা যায়, শতসহস্র সেগুন, কুরু জঙ্গল, মহুয়া, সাজা, সেনহা, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, মোয়েন গাছের জঙ্গল। আবার মাঝে মাঝেই বর্ষায় ফুটন্ত ফুলের সুগন্ধে ভরা ছোট ছোট ডিমাকালির ঝোপ; কখনও দেখা যায় সুগন্ধী কেওড়া। আর এই অরণ্যগন্ধের সঙ্গে মিলে-মিশে মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে দু'একটি বন্য গ্রাম। এভাবেই চোখে দেখা মহানদী তীরবর্তী বন-পাহাড়, জল-জঙ্গল, বনস্পতি, নানারঙের সুগন্ধী ফুল সম্বলিত এক সুবিস্তৃত নিসর্গ-প্রকৃতির শোভা (Beauty of Nature) যে সাবলীল ভাষা-তুলিতে চিত্রায়িত করলেন ঔপন্যাসিক, তা পাঠ করতে করতে সুপাঠক মুগ্ধ হয়ে যায়, যেন সেই অপরূপ সুন্দর নদী-প্রকৃতি জীবন্ত সত্তা নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

যাইহোক, 'মহানদী' উপন্যাসের কাহিনি নদী, নদীর গতিপথ ও নদীতীরের পাহাড় ও ঘনজঙ্গলের প্রাকৃতিক দৃশ্য-সৌন্দর্যের কথা শুধু নয়, এ উপন্যাসের কাহিনি শেষপর্যন্ত নদী তীরবর্তী প্রান্তিক ও একান্তই দুঃখী জন-জীবনের কাহিনি। অনিতা অগ্নিহোত্রী নিজেই বলেছেন —

> "প্রান্তিক মানুষের প্রতি আমার পক্ষপাত। ...এ কাহিনি শেষপর্যন্ত নদীর নয়, মানুষেরই হল।"[৩]

অতএব 'মহানদী' উপন্যাসে মহানদী তীরবর্তী প্রান্তিক জনজীবনের বৃত্তান্ত তুলে ধরাই কথাকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে অনিতা অগ্নিহোত্রী 'মহানদী' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন মহানদী অববাহিকার মানুষদের। অতএব, মহানদী অববাহিকার বিস্তৃত অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা, তাদের জীবন-সংগ্রামের কথা তুলে ধরবেন—এটাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গক্রমে অনিতা অগ্নিহোত্রী বলেছেন—

> "মহানদী উপন্যাস এক চলনশীল জঙ্গম সত্তার আখ্যান, যার সঙ্গে জুড়ে গেছে তার কূল ঘেঁষে, উৎস অঞ্চলে, মধ্যভাগ বা অববাহিকায় বাস করা মানুষের জীবনবৃত্তান্ত।"[৪]

প্রবহমান মহানদী অববাহিকা অঞ্চলের বন্যপ্রায় আদিম গ্রামগুলিতে প্রান্তিক ও নিম্নবর্গ (Subaltern) সম্প্রদায়ের মানুষকে বসবাস করতে দেখা যায়। এখানে আছে আদিবাসী গোঁড়জাতি, এছাড়া অ-আদিবাসী মানুষও আছে যথেষ্ট। কামার, সাহু, নগারচী, মিসাদ বা নাপিত, মাছ ধরিয়ে কেওট, যাদব, সতনামী ইত্যাদি। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথম পর্বে ছত্রিশগড়ের সিহাওয়ায়, মহানদীর উৎসের নিকটবর্তী চন্দনবাহারা নামক একটি বন্য গ্রামের জনজাতির জীবনচিত্র তুলে ধরলেন, যারা অত্যন্ত দরিদ্র ও নিম্নবর্গ সম্প্রদায়ের মানুষ। মহানদীর উপত্যকার এ গ্রামে মূলত চল্লিশ ঘরের মতো আদিবাসী গোঁড়জাতির বসবাস। ছত্তিশগড়ের এ অঞ্চলে গোঁড়জাতি ত্রিশ শতাংশ। এরা সবাই বৈদ্য। বৈদ্যরা জঙ্গলের ঔষধি গাছ-গাছড়া চেনে, তাদের গুণ জানে। আদিবাসী গোঁড়জাতির প্রতিনিধি তুলারাম সাঁকরা রেঞ্জার বন-বিভাগে গত শীতকাল থেকে কাজে যোগ দিয়েছে, তার সহকর্মী অবধুত সিং। কথাকার-সৃষ্টি তুলারাম ধুরু চরিত্র যেন এই অরণ্য মালভূমির আদি সন্তান। দেখা যায়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই বিস্তৃত অববাহিকার নদ-নদী, পাহাড়, জল-জঙ্গলের প্রকৃতির মতোই এখানকার অরণ্য-সন্তানেরাও নিতান্তই সহজ-সরল, অকপট, উদার ও প্রসন্ন। এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অরণ্য-সন্তান তুলারামকে শহর থেকে আসা নেতা রাজা সুজনকুমারের সঙ্গে তাই অতি সাবলীল ভাবেই কথা বলতে দেখা যায়। আর তাই তো স্বার্থসন্ধানী চতুর রাজনৈতিক নেতা সুজনকুমারের চোখ-মুখের ইশারা, শোনার ভঙ্গি ইত্যাদি লক্ষ করেও না দেখার ভান করে তাদের 'রাজোয়া'র এক একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছে একেবারে ধীর, স্থির, হাস্যময়, ছত্তিশগড়ি ভাষায়। কথাকার অনিতা তুলারামের নির্ভীক সত্ত্বার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"এই রাজাকে ভয় নেই তুলারামের, সে যেন দেশ-গাঁ মাটির খবর দিতে এসেছে কোনও পড়শিকে... ।"[৫]

তুলারাম প্যাসেঞ্জার গাড়ির মতো ব্যস্ততাহীনভাবে বলে যায়, আর সুজনকুমার শোনেন, — গুর্মা, তেজরাজ, ভোজরাজ, অনন্তমূল শ্বেতপ্রদর, কেকরা, সিংগি, বাকচৌড়ি ইত্যাদি প্রায় শ'দেড়েক ওষধি গাছ ও তার ঔষধিগুণের কথা। সাঁকরা রেঞ্জার অফিসের লাগোয়া গুদাম ঘরে ওষুধ তৈরি করতে যায় তুলারাম। মৃগী রোগের চিকিৎসায় তার ভারী নামডাক। এছাড়াও নানা অরণ্য পশুপাখি, নানা জাতের সাপ, সীতা নদীর আনোখা জানোয়ার— সালখপ্পির ইত্যাদির খবর রাখে সে। তুলারামের মুখে এই অরণ্যের নানা রহস্যের কথা যত শোনে ততই যেন আশ্চর্য হয়ে যান সুজনকুমার। মনে মনে তিনিও এই অরণ্য সন্তানের প্রশংসা না করে পারেন না, —

"তুলারাম গোঁড় একটি সোনার খনি, মানুষটার মধ্যে শত শত বছরের জানা, আনন্দ, ইতিহাস পাললিক শিলার মতো চুপ করে বসে আছে—"[৬]

যাইহোক, ছত্তিশগড় নতুন রাজ্য হওয়ায় অতি নিম্নবিত্তের গোঁড়জাতির মানুষেরা খুবই খুশি। আগে দু-আড়াই হাজার টাকা খরচ হত রাজধানী ভোপাল যেতে। আর এখন তারা একবেলার মধ্যে রায়পুর গিয়ে ফিরে আসে। আজকাল গোঁড়রা আর দূর গ্রামে কাজ খুঁজতে যায় না। ঘরে বসেই তিন টাকার চাল পাচ্ছে অপর্যাপ্ত। তাদের ছেলেমেয়েরা এখন স্কুল যাচ্ছে, হস্টেলে থাকছে। নতুন রাজ্য পেয়ে তারা যেন এখন সত্যিই 'আজাদ' পেয়েছে।

একদিকে আদিবাসী গোঁড়জাতি তুলারামদের শুষ্ককঠিন জীবনচিত্র, অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের স্বার্থান্বেষী মনোজগতের চালচিত্র— এই দুই বিপরীত (Contrust) ছবি, বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতা-বুননেই 'মহানদী'র আখ্যানপট নির্মাণ করলেন ঔপন্যাসিক অনিতা অগ্নিহোত্রী। ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী তুলারামকে অরণ্য-সন্তান বলে ডাকেন, আবার রাজনৈতিক নেতা সুজনকুমারও তাকে বৈদ্যরাজ উপাধি দিতে চান, যার পেছনে অবশ্যই আছে রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি। আদিবাসী গোঁড়জাতির অত্যন্ত কষ্টের জীবনকথা এই নেতাদের মনে কোনরকম রেখাপাত ফেলে না। দুমুঠো ভাত আর দুটা মকাইয়ের রুটির জন্য কী খাটুনিই না খাটতে হয় তাদের। সামান্য ওষুধের কারবারে তাদের চলে না। অধিকাংশ গোঁড়দেরই জমি নেই। তুলারাম ও তার স্ত্রী পুনরি দুজনে ফার্সিয়ার কাছে সম্পন্ন চাষীদের জমিতে কাঁধে লাঙল দিয়ে খেত জুতে, ভাগচাষে বিড়িপাতা তুলে মহাজনের কাছে ঠকেছে টাকার হিসাবে। ধান কুটে, পাথর ভেঙে পুনরির আঙুলগুলি কেটে রক্তাক্ত হয়ে থাকত তার কোমল বয়সে। যদিও এখন বুড়ো বয়সে অল্প স্বাচ্ছন্দ এসেছে তাদের সংসারে।

ভোট আসে, ভোট যায়—আর একজন সাধারণ মানুষ, অন্য সব সাধারণ মানুষের ভোটে জয়লাভ করে একসময় অ-সাধারণ হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতারা স্থায়ী প্রতিপত্তি বা ব্যক্তিস্বার্থ লাভের জন্য তখন দেশের দরিদ্র-সাধারণ মানুষের ওপর কখনও রাজনৈতিক চক্রান্ত (Politics) করে, কখনও বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি (Fake promise) দিয়ে থাকে রাজ্যের তথা দেশের প্রধানেরা। রাজনৈতিক নেতাদের এই অন্তঃসারশূন্যতার উলঙ্গ ছবিটি বাস্তবসম্মতভাবেই এখানে তুলে ধরলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। সম্বলপুরের কাছে জামদায় রাজ্যের উপকূল অঞ্চলের স্বার্থে গড়ে উঠবে হীরাকুদ বাঁধ বা জলাধার। এরজন্য উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের দু'শো গ্রাম চলে যাবে জলের তলায়। মুখ্যমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহতাব তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) জওহরলাল নেহেরুকে দিয়ে ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে হীরাকুদ বাঁধের শুভারম্ভ তথা বাঁধের ভীত-প্রস্তর স্থাপন করতে এসে বললেন—

"কষ্ট যদি পেতেই হয়, তবে দেশের স্বার্থে কষ্ট স্বীকার করো।"[৭]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কষ্ট পেয়েছে মানুষ, তবে কতটা দেশের জন্য, আর কতটা ক্ষমতাশালী শ্রেণির স্বার্থপরতায়— তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীও তখন ঘোষণা করে বলেন, এই মহৎ উদ্দেশ্যে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসননীতি প্রকল্পে ঘরের বদলে ঘর, জমির বদলে জমি এবং যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তখন কেউ জানত না, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ছিল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। যাইহোক, প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন, ভূমিপূজা হবে, অবশিষ্টদের দ্রুত জামদা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কেউই ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পেল না। একর প্রতি মাত্র চারশো টাকা নিয়ে তাদের চলে যেতে হয়েছিল। অধিকাংশকেই উঠে যেতে হয়েছিল খালি হাতে। গৌতম কালো, চেমা কালোরা— ২৪টি হতদরিদ্র, প্রায় ভূমিহীন, আদিবাসী ও তপশিলি উপজাতি পরিবার কোনও সময়ই পায়নি। রাঁধা ভাত, কোটা তরকারি পোটলায় বেঁধে রওনা দিতে হয়েছিল জামদা থেকে, কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই। গৌতম কালোরা আশা করেছিল, শেষ পর্যন্ত হয়তো গ্রাম ছাড়তে হবে না। সরকার তাদের সিদ্ধান্ত বদলাবে। কিন্তু তারা Victim, তারা নিরুপায়। দেশান্তরিত হতেই হবে তাদের!

১৯৪৭-র দেশভাগের কারণে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষদের উদ্বাস্তু হয়ে দেশান্তর হতে হয়েছিল। বিশাল সংখ্যক মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল— রক্তক্ষয়ী, ভয়ংকর, স্বদেশ ও স্বজন থেকে চিরবিচ্ছেদের সেই ইতিহাসের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু দেশের স্বার্থে, বলতে গেলে একটা রাজনৈতিক শ্রেণিস্বার্থের উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতে ১৯৫৬ সালে জামদা, কুঠেরপালি ইত্যাদি দু'শো গ্রামের নিম্নশ্রেণির মানুষের উপর যে ভয়ংকর অভিঘাত নেমে এসেছিল— তা সেখানের হতদরিদ্র মানুষেরা মেনে নিতে পারে নি। চোখের জলে ভাসিয়ে চিরপরিচিত, পুরুষানুক্রমিক, জন্মভিটা থেকে শেষ শিকড় ছিঁড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা ঠিকানা নুয়াবলন্ডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়েছিল। অশ্রুভেজা বুকভাঙা সেই মহাযাত্রার চিত্র এমন মরমী ভাষায় বর্ণনা করলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, যা আমাদের চোখের সামনে খুব পুরনো একটা সাদা-কালো Documentary-র মতো মনে হয়—

> "খেতের পাকা ধান ডুবে যাচ্ছিল ওদের অসহায় চোখের সামনে। জল এসে গেছে। ডুববে একশো চল্লিশটার উপর গ্রাম— যারা মহানদীর দুই তীরে ছড়িয়ে। ...মেয়েরা আসছিল ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে। সারা পথ কেঁদেছিল তারা, নানাভাবে। পুরানো গীতে, ভাঙা ভাঙা সুরের সঙ্গে বুকের বিলাপ মিশিয়ে। পুরুষদের মুখ ছিল কঠোর, গম্ভীর, বিষণ্ণ। ...সরকার খেদিয়ে দিল। এটা বড় মনে লেগেছিল ওদের সবার। স্বাধীন ভারতের সরকার। ...কোথায় মহানদীর কূলে সদা-জলে ছলছল কুঠেরপালি আর কোথায় পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা জুজুমুরা পঞ্চায়েতের নুয়াবলন্ডা। ...ওরা সবাই পোঁটলা পুঁটলি গোরুবাছুর নিয়ে দু'দিন দু'রাত পথ হেঁটে হাঁ ক্লান্ত সন্ধ্যেবেলা যখন নতুন বসতে এসে পৌঁছেছিল সাতান্ন বছর আগে, তখন চৈত্র শেষের সূর্য অস্ত যাচ্ছে কান্নাপাট পাহাড়ের পিছনে— আকাশ গনগনে লাল, যেন রেগে ফেটে পড়েছে মৃত্তিকার সন্তানদের লাঞ্ছনা দেখে।
>
> ...নুয়াবলন্ডার কাছে কোনও নদী নেই, কয়েকটি কুয়ো খুঁড়ে দিয়েছে সরকার থেকে, তার জল পানের অযোগ্য, বাড়িঘর নেই, গোশালা নেই, তুলসীমঞ্চ নেই—কেউ ভাত রেঁধে পথ চেয়ে নেই তাদের জন্য—আর, পিছনে যা কিছু ছিল সেখানে আর কোনও দিন ফিরে যেতে পারবে না তারা। মহানদী জলভাণ্ডারের অগাধ জলরাশি ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাদের পুরনো গ্রাম কুঠেরপালি, তাদের ঘরবসত ভিটে মাটি, ধানের খেত, উৎসব পার্বণের চণ্ডীমণ্ডপ, মন্দির পাঠশালা—সব কিছু। ...শ-দেড়েক মানুষের জীবনের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের উপার্জন হিসেবকিতেব সব শূন্য হয়ে গেছে একদিনে— তখন হু হু করে কেঁদে উঠল তারা সবাই মিলে। মেয়েরা প্রথমে, তারপর পুরুষদের কান্নাও বাঁধা মানল না— ডুকরে ডুকরে কাঁদল তারাও। এদের কান্না শুনে হাম্বা ডাকে উতল হল গাইগরুগুলি, খাঁচার টিয়ে-ময়নারা চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠল, মাথার উপর চৈত্র চতুর্দশীর চাঁদ প্রায় গোল, রাঙা ও সূর্যের মতো রাগী, তাদের আলো দিতে থাকল—আর নতুন অতিথিদের গ্রামে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের কান্নার প্রতিধ্বনি তুলল জঙ্গলের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা শিবাদল।"[৮]

কিন্তু জীবনের উপর দুঃখ ও দুর্দশার ঝড় বয়ে গেলেও, চিরপরিচিত শেকড় থেকে আজীবনের মত উৎপাটিত হয়ে গেলেও মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়াতে চায়, বেঁচে থাকার জন্য নতুন আশা-স্বপ্ন নিয়ে আবার বুক বাঁধে; যদিও অতি সাধারণ মানুষের স্বপ্ন সবসময় পূরণ হয় না। এই প্রান্তিক মানুষেরা উদ্বাস্তু হয়ে মহানদীর পশ্চিমকুলের কুঠেরপালি গ্রাম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থেকে উঠে আসে দক্ষিনে জুজুমুরার নুয়াবলন্তা নামক বন্য গ্রামে। কিন্তু এখানে এসে তারা তাদের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে খুঁজে পেল না। চারিদিকে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। এই জঙ্গল সাফ করে কৃষিজ জমি করে তুলতেই যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে যায়। খেটে খেটে তাদের হাড় বেরিয়ে আসে, চামরা ঝুলে পড়ে। স্কুল, হাসপাতাল কোন কিছুই ছিল না। শহর থেকে সপ্তাহে একদিন ডাক্তার আসত। মুষ মরার হাল হলে নিরুপায় হয়ে আত্মীয়স্বজনরা রোগীর মুখে মহানদীর জল দিয়ে বসে থাকতো। কুঠেরপালির মানুষরা ভেবেছিল একসঙ্গে আবার তারা বসত করবে, নতুন গ্রাম গড়বে। কিন্তু হতদরিদ্ররা কিছুই পায়নি। এটাই ছিল তাদের স্বপ্ন-কল্পনার ট্রাজেডি (Tragedy)।

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা (Indian Civilization) পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম। নিজস্ব ঐতিহ্য, নানা আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ, ব্রত, বিশ্বাস-সংস্কার, নানা ভাষা, নানা পরিধান, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যরূপ-সম্বলিত আমাদের এই ভারতবর্ষীয় সভ্যতা। অঞ্চল-ভেদে ভারতবর্ষের সকল মানুষ নিজস্ব পরাম্পরাগত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে সুখে-দুখে-আনন্দে বেঁচে আছে। মহানদী অববাহিকায় বসবাসকারী দরিদ্র-সাধারণ প্রান্তিক মানুষদের জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোত ভাবে যে বিশ্বাস-সংস্কার জড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে আমাদের যেন সেতুবন্ধনের কাজটি করলেন কথাকার অনিতা অগ্নিহোত্রী। মহানদী তার উৎস থেকে যতই মোহনার দিকে এগোতে থাকে বদলে যায় তার রূপ। নানারূপধারী মহানদী, সমতল এলাকা সুবর্ণপুরে একেবারে পুর্ণযৌবনা। নদী এখানে শান্ত, প্রায় মৃদুকলভাষিনী। তবু তার বিস্তার আর রূপের বৈচিত্র্যে চোখ ভোলায়। গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদী তীরবর্তী জনজীবনের কর্মপ্রবাহটিও পালটে যায়। এই নদী কখনও হয়ে যায় সাধারণ মানুষের জীবিকার মাধ্যম। এই নদী তাদের কাছে রহস্যময়ী দেবী মা। আর নদী মা-কে কেন্দ্র করেই জেগেছে অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার। সুবর্ণপুরে মহানদীর মাঝামাঝি লঙ্কেশ্বরী দহটি অবস্থিত, সেখানের মাঝি-মাল্লার লোকসমাজে প্রাচীনকাল থেকেই এক মিথ প্রচলিত হয়ে আসছে যে, এই দহেই আছে তন্ত্রের দেবী লঙ্কেশ্বরী। নৌকা নিয়ে তারা সাবধানে পার হয়। দেবীকে শান্ত করতে নদীতীরের পাথরের উপর সিঁদুর দিয়ে পূজা করে থাকে কৈবর্ত সমাজ অর্থাৎ কেওট-ধীবর, নৌকা চালনা করা, মাছধরা ইত্যাদি নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এ নদীর দেবী কেবল পূজার জন্যই নয়, ইনি জীবিকারও রক্ষাকর্ত্রী। কেওটদের জীবন-ধর্ম বাঁচিয়ে, তাদের খাইয়ে-পরিয়ে রেখেছে এই নদীজল। কেউ মাছ ধরে, কেউ আবার নৌকা বায়। তবে কৈবর্তের ছেলে নীলকণ্ঠ নৌকাও বায়, মাছও ধরে। এ অংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’র কুবের মাঝির কথা, কখনও বা অভিজিৎ সেনের ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’ ও ‘নিম্নগতির নদী’ উপন্যাসের লোক-সামাজের নদীকে নিয়ে বিশ্বাস-সংস্কারের দিকটির সাদৃশ্য দেখা যায়। যাইহোক, এই মাছ ধরা আর নৌকা বাওয়া নিয়ে মহানদী নদীতীরবর্তী এই নিম্নশ্রেণির মানুষেরা একরকম সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু হীরাকুদ বাঁধ বাধাঁর পর থেকেই কেওট-ধীবরদের জীবনগতি যেন থেমে যায়। সহজ সরল এই গরিব মানুষেরা এক অযাচিত সংকটের সম্মুখীন হয়। বাঁধ ও নানা জায়গায় ব্রিজ হওয়ায় নদীর জল কমে যাওয়া, কখনও বা লোভনীয় ব্যবসায়ীদের নদীর জলে ব্লাস্টিং-এর জন্য নদীর মাছ দ্রুত কমতে থাকার জন্য নীলকণ্ঠদের মতো মাছধরা ধীবরদের জীবিকা মার খেতে থাকল। চাষ করতে তো তারা জানেই না, তাছাড়া নিজেদের জমিও নেই। সারাবছর নদীতে যে মাছ ধরতে পাবে সেই আশা আর থাকল না। ফলে দৈনন্দিন জীবনে এই হতদরিদ্র ধীবররা আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ল। আবার ধনী, স্বার্থলোভী মহাজন সম্প্রদায় কর্তৃক নিম্নশ্রেণির মানুষদের শোষণ-বঞ্চনার দিকটিও উপন্যাসে ধরা পড়ল। বৌদ্ধ জেলার পরাগলপুরের ঝরা সম্প্রদায়ের মানুষেরা মহানদী থেকে যে চিংড়িমাছ ধরে, তা বাজারে ন’শো টাকা কিলো। কিন্তু সেখানের মহাজনেরা গ্রামে গ্রামে ঝরাদের বাড়িতে সকালেই এসে উপস্থিত হয় এবং মাত্র আড়াইশো টাকা কিলো দরে নিয়ে যায় তাদের অতি কষ্টে ধরা চিংড়ি মাছ। ন্যায্য টাকা দাবি করতে পারে না এইসব নিরীহ ঝরা সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

আবার জঙ্গিরা গ্রামের পার্বতী ও বৃন্দাবন কেওটদের প্রসঙ্গেও প্রায় একই রকম চিত্র ধরা পড়েছে লেখকের কলমে। অত্যন্ত বুকভাঙা কাহিনি এই পার্বতীর। জঙ্গিরার কেওট পরিবারের বউ পার্বতী। তার স্বামী বৃন্দাবন কেওট জলজীবী। কিন্তু সে বর্তমানে রোগগ্রস্ত, তার ওপর আবার মাছ ধরার মরশুম ছাড়াও রোজ সন্ধ্যেবলায় চোলাই খেয়ে চুর হয়ে থাকে। কেওট পাড়ার আরও ষাট-সত্তর জেলের একই অবস্থা। তারা মাছ ধরত গ্রামের সামনের গাঙে। চিরকাল জোয়ারের জল দিনে তিনবার করে ঢুকে মোহনার মুখে। সঙ্গে নিয়ে আসে সমুদ্রের মাছ। জাল ফেলে ডিঙিতে বসে মাছ

ধরে তারা চিরকাল। আর পারাদ্বীপের বাজারের কূলে ডিঙিতে বসেই বেচে। কিন্তু চার বছর হল সার কারখানার বিষ জলে পড়ে বিষাক্ত করে তোলে নদীর জল। ফলে জোয়ারের জল আসলেও আর আগের মতো মাছ আর নদীতে ঢুকে না। এখন কেওটদের মাছ ধরতে যেতে হয় সমুদ্রে, কিন্তু তাতে ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। সারাদিন টহল দেয় মেরিন ফিশারীর নৌকা। লুকিয়ে প্রাণ হতে নিয়ে তাদের মাছ ধরতে হয়। মাছ ধরতে গিয়ে ছেলে নিখোঁজ হলে চোরের মায়ের মতো কান্না চেপে থাকতে হয় পার্বতীদের। এখন শাড়ি ব্লাউজ কোনটাই পরিষ্কার থাকে না পার্বতীদের, শুকনো মাছের আঁশ গন্ধের আধোয়া মাথা ও কাপড়ের চামসে বাস তার দেহে। বাড়িতে হাড়ি চড়ে না রোজ। বড় ছেলে গদাধরকে শহরের হোটেলে কাজ করতে পাঠিয়েছে বাধ্য হয়ে। পারাদ্বীপের গনেশের হোটেলে বেতন ছাড়া খাটতে খাটতে ছেলের মুখে রক্ত ওঠার অবস্থা দেখে পার্বতীর মাতৃ-হৃদয় হু হু করে কেঁদে ওঠে। লুনকুয়ায় সীমান্তের পোড়ামাটির শিল্পকারখানা 'মৃত্তিকা'য় কাজ করে পার্বতীর দূর-সম্পর্কীয় পরিচিত যুবক শ্যাম। পেটের দায়ে ও শ্যামের হাতছানিতে প্রথমত ইচ্ছা না থাকলেও একদিন বাধ্য হয়েই সীমান্তের পুতুল কারখানা 'মৃত্তিকা'য় যোগ দেয় সে। কাজ শেখানোর নাম করে দুশ্চরিত্র শ্যাম পার্বতীর শরীর স্পর্শ করে। ক্রমে ক্রমে একদিন নিতান্ত বাধ্য হয়েই শ্যামের যৌন আবেদনে সাড়া দেয় পার্বতী।

আধুনিক বয়ন শিল্প (Weaving Industry)-র ফলে পাওয়ারলুম অর্থাৎ যান্ত্রিক তাঁতবস্ত্র এখন বাজার দখল করেছে। হাতের তাঁত (Handloom)-এর নকশা, বুনন ও গুণগত মান অনেক বেশি সূক্ষ ও টেকসই হলেও ঐতিহ্যবাহী দেশীয় তাঁতশিল্পীরা রীতিমত মার খাচ্ছে। কারণ দেশি-বিদেশি মেশিন-তৈরি তাঁত সস্তা ও সহজলভ্য। অন্যদিকে সময়সাপেক্ষ ও দামি হওয়ায় দেশীয় তাঁতির তৈরি কাপড় আধুনিক চাকচিক্যের প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে পারে না। দেশীয় শিল্প, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক এই তাঁতশিল্পীদের অস্তিত্ব এখন সংকটে পড়েছে। ব্যবসা খারাপের ফলে আয় কমে যাওয়ায় তাঁতিরা পরিবার চালাতেই হিমসিম খাচ্ছে, অনেকে বাধ্য হয়ে পেশা পরিবর্তন করছে, কেউ কেউ বা নিরুপায় হয়ে কখনও বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'মহানদী' উপন্যাসে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির সংকটাপন্ন ভারতীয় তাঁতশিল্পীদের চরম দুর্দশার ছবিটিও আমরা দেখতে পেলাম। সুবর্ণপুর ও কটকের নুয়াপাটনা অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের নামডাক দেশে বিদেশেও। ত্রিশ বছর দাপটে চলেছিল সেই সুতোকল। বরগড়ের তাঁতিরা বেশি করে সুতোর কাজ আর সুবর্ণপুরের নামডাক রেশমের কাজে। সারা রাজ্যের জাতীয় সম্মান আর রাজ্য সম্মান পাওয়া শিল্পীদের নব্বই ভাগই এই দুই জেলায়। এরা সকলেই কৌলিক প্রথায় তাঁতশিল্পী—অর্থাৎ মেহের সম্প্রদায়। এছাড়াও আছে কুলি মেহের, যারা আদিবাসী। সে অঞ্চলের তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষও তাঁতের কাজ করে। তাঁতিদের অবস্থা এখন সংকটাপন্ন, গত তিন দশকে বৈদ্যনাথ, কেন্দুবালি, বেহেরামাল, নিম্মা, তরঙা ইত্যাদি গ্রামের তাঁতশিল্পীরা কয়েকটি সারকথা বুঝেছে যে, তারা আসলে শিল্পী নয়, তারা মজুর মাত্র। বুঝেছে সমিতির ভরসায় থাকলে মাসে দিন সাতেকের বেশি কাজ পাওয়া যাবে না, এবং ভবিতব্য শুকিয়ে মরা। তার ওপর বর্তমানে মাছ, টিয়া, হাতি, নৌকা আঁকা তাঁতশাড়ি শহরের মানুষ আর পরতে চায় না। এসব ছাপানো শাড়ি শুধুমাত্র পরবে গ্রামের মানুষ, অর্থাৎ গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতি আর শহরে চলছে না। গ্রামীণ তাঁত এখন পুরোটাই স্বার্থপর ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের নিয়ন্ত্রণে। বৈদ্যনাথ গ্রামের এমন এক স্বার্থপর ব্যবসায়ী রমেশ। জাতীয় সম্মান পাওয়া তাঁতশিল্পী মথুরা মেহেরের তাঁতের জাদুকরি কাজও যার চোখে লাগে না। এই সমস্ত স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের চক্রান্তেই দেশি তাঁতশিল্প আজ বিপন্ন, বিপন্ন গ্রামের এই মেহের সম্প্রদায়ের বহু মানুষের জীবন-জীবিকা। একইভাবে নুয়াপাটনাতেও নানা দুর্নীতিতে মুখ থুবড়ে পড়ল মিলগুলি। এখনও পুরোনো মজুররা কেউ কেউ মিল সংলগ্ন বেঞ্চিতে এসে বসে। এখনও আশা করে হয়তো আবার কোনোদিন সুতোকল খুলবে। তাঁতকে ঘিরে তাদের সংসারের স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু তা আর হয় না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঞ্চ থেকে উঠে আবার তারা বাড়ি ফেরে রীতিমত হতাশ হয়ে। তাদের দিন চলবে কী করে, এই দুশ্চিন্তা মাথায় ঘোরে। মানিয়াবন্ধের রঙ্গনী বান্ধকার ও বুনাকাররাও একই সমস্যায় পড়েছিল। তার ওপর আবার ১৯৯০-র ওড়িশার প্রবল ঘূর্ণিঝড় মহাবাত্যায় মহানদী, কাঠজোরী ইত্যাদি নদীর জল এসে নুয়াপাটনা-তিগিরিয়া-মানিয়াবান্ধার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দরিদ্র জনবসতি ও কোনোরকমে টিকে থাকা সুতোকলগুলিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে যায়। স্বল্প রিলিফের টাকায় সেগুলি আর মেরামত করা হল না। অনাহারে,

হতাশায়, অপমানে ও দারিদ্রবিষে জর্জরিত হয়ে কর্ণতোষের মতো সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া তাঁতশিল্পীরদের সুতো রাঙানোর কেমিক্যাল পটাশিয়াম নাইট্রেট খেয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

এই আখ্যানের প্রবহমান গ্রাম-জনপদের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে কথাকার আমাদের এমন এক বন্যগ্রামের মুখোমুখি হাজির করালেন যা আধুনিক সভ্যসমাজ থেকে বহুদূর, যেখানে একবিংশ শতাব্দীর আলো-বাতাস এখনও পৌঁছায়নি। নয়াগড় জেলার সাতকোশিয়া অভয়ারণ্য এলাকায় পনের মাইলের মতো পথ নদীকে সীমায় বেঁধেছে দু-ধারের পাহাড়। সমতলের বিস্তীর্ণ নদীর সৌন্দর্যে এমন বিচিত্র নেই, যা আছে সাতকেশিয়ায়। কলকাতা শহর থেকে রঙ্গনাথন এসেছে এখানে। বহতা জল তাকে বার বার টানে। তবে এবার কেবল নদীর টানে নয়, এসেছে এখানে মানুষের খোঁজে। রঙ্গ সাংবাদিক। এমনিতেই মানবিক কাহিনির সন্ধানেই থাকে। নাগরিক গল্প নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবন-জীবিকা, মানুষের লড়াই, তাদের বিপন্নতা ইত্যাদিই উঠে আসে তার কলমে। সহসঙ্গী সুমনাকে নিয়ে সাতকোশিয়া অভয়ারণ্যের নদীতীরের বন-বাংলোতে উঠেছে। বাংলোর কর্মচারী কন্ধ আদিবাসী হরমু জানির সঙ্গে নৌকাতে করে তারা মহানদী বিহার করে। রঙ্গর পিপাসা মেটানোর জন্য হরমু জানি তাদেরকে হাঁটাপথে নিয়ে যায় অরণ্যগ্রাম মালিশাহী আর বাইশপল্লি। এরপর নিয়ে যায় তার নিজের গ্রাম কুটুরিতে। এই কুটুরি গ্রামের যে বর্ণনা অনিতা অগ্নিহোত্রী দিয়েছেন, তা সত্যিই ভয়ংকর। হরমু জানিদের গ্রামের চেহারা দেখে রঙ্গ ও সুমনার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। এই কুটুরি গ্রাম কেবল হতদরিদ্র নয়, হতাশ্বাস, হাল ছেড়ে দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে থাকা মানুষের মত এ গ্রাম। কোর এরিয়া (Restriction Area) বলে এখানের মানুষেরা সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এ গ্রাম যেন এক আদিম পৃথিবী। মহানদী অববাহিকায় অবস্থিত এই বীভৎস আদিম গ্রামের বর্ণনায় কথাকার বলেছেন—

> "ছোট্ট গ্রামটা। কুটুরি। কোর এরিয়ার একদম গহনে, চারদিকে ঘন জঙ্গলে। তারই মধ্যে পাতা বা টালি ছাওয়া মাটির ঘরে মাথা গুঁজে বাইশ-তেইশটা পরিবার। বেড়ার ধারে ঐরকমই একটি হেলে পড়া ঘর, তার চালে চালকুমড়ো ফলেছে, সামনে অল্প একটু খালি জমিতে দুটো খাটিয়া পেতে হতাশ বিরক্ত কয়েকজন বসে আছে, তারা হয়তো বয়সে বুড়ো নয়, কিন্তু দারিদ্র আর অপুষ্টি তাদের সময়ের আগেই ঝলসে বুড়ো করে দিয়েছে। জঙ্গলের ভিতরে এ এক কন্দ গ্রাম। ভিতর বলে নয়, নয়াগড় ও পাশের ফুলবনী বহু গ্রামেই এমন ভূমির নিজস্ব সন্তান কন্ধদের বসবাস।"[৯]

সুমনা, রঙ্গ ও হরমু জানির সংলাপে, সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের উদাসীনতায়, যেন এক নেই রাজ্যের বাসিন্দা হরমুদের গ্রামের রূঢ়-বাস্তব ছবিটি আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন কথাকার।

হরমু জানি— "কোর এরিয়া বলে কুটুরি গ্রাম থেকে অন্য জনপদে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। ...যানবাহন নেই ওদের জন্য, যানবাহন নেই কারণ পথ নেই।"

সুমনা— "একশো দিনের কাজের প্রকল্পে রাস্তা বানানো যায় না?"

হরমু জানি— "কোর এরিয়ার মধ্যে রাস্তা বানানোর কাজ বারণ।"

সুমনা— "মানুষ তবে কি করে?"

হরমু জানি—"দেখছেন তো আমরা কি করি—সকাল থেকে এভাবে বসে আছি। সারাদিন কোনও কাজ নেই। কর্মহীন বসে আছে, বসে বসে ঝিমোচ্ছে একটা গ্রাম,...। খিদে পায়, বুঝলেন সারাদিন। খিদেতে গা মাথা ঝিমঝিম করে। সকালে উঠেই খেজুর বা সলপেই খেয়ে নিই। হ্যাঁ, দুটাকা কিলোর চাল পাই। কেরোসিন মাঝে মধ্যে। সন্ধ্যেবেলাটা অন্ধকারেই কাটে। মেয়েরা জঙ্গলে গিয়ে নিচে পড়ে থাকা জ্বালানি কাঠকুটো আনে আর কন্দমূল। ছেলেপুলেরা তাই খেয়ে খিদে মেটায়।"

রঙ্গ— "চাষ করলেই তো হয়?"

হরমুদের গ্রামের এক চাষী— "চাষ তো করি! ফসল তুলতে না পারলে মুআবজা দেবে কার বাবা? ...চাষের জল নেই। নদীতে এতো জল, আমরা তুলতে পারব না। কোর এরিয়া! বর্ষার জল ভরসা করে যেটুকু ধান, মকাই

আর শাক সবজি ফলাই, পায়ে দলে নষ্ট করে উপড়ে দিয়ে যায় নীলগাই, বরাহ আর হাতির দল! নালিশ করব কার কাছে? বনের প্রাণীর রক্ষার জন্য আইন আছে, মানুষের পেটের খিদে মেটাবার জন্য কোনও আইন নেই। ছেলোমেয়েগুলো মানুষ হচ্ছে না। ক্লাস ফাইভ পড়ে ঘরে বসে থাকছে। ... পুরো গ্রাম তো অজ্ঞ মূর্খ।”[১০]

আঠারো কিলোমিটার দূরের ছামুড়িয়ায় স্কুল ও হাসপাতালে পৌঁছাতে পারে না তাদের সন্তানেরা, মুমূর্ষু রোগীরা। লড়াই করতে করতে তারা যেন হয়রান হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনরকমে দিনগুজরান করে থাকে এই আদিবাসী কন্ধ মানুষেরা। সবদিক থেকে বিদ্ধস্ত হয়ে যাওয়া এই প্রান্তিক আদিবাসী কন্ধদের যে রুদ্ধশ্বাস জীবনের বর্ণনা করলেন কথাকার, তা পাঠকালে পাঠক সমাজকেও শিহরিত ও কন্টকিত হতে হয়।

এভাবেই কথাসাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর ‘মহানদী’ উপন্যাসে প্রবহমান মহানদী অববাহিকা তীরবর্তী আদিবাসী গোঁড় জাতি, বুনাকার, তাঁতশিল্পী, কেওট-ধীবর, কামার, সাহু, নগারচী, যাদব, সতনামী প্রভৃতি প্রান্তিক নিম্নশ্রেণি-সম্প্রদায়ের নিজস্ব কর্ম-পেশা ও স্থানীয় বিশ্বাস-সংস্কার অবলম্বনে কোনরকমে টিকে থাকা মানুষদের জীবন-সংগ্রাম, ক্রমাগত অবক্ষয় হওয়া এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, শোষণ-বঞ্চনার আখ্যান এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন, যা পাঠ করে পাঠক সমাজেরও সেই সম্প্রদায়ের প্রতি জাগে সহানুভূতি, জাগে অনুকম্পা।

Reference:

১. অগ্নিহোত্রী, অনিতা : ‘পূর্ববৃত্ত’, ‘মহানদী’, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১১
২. ঐ
৩. অগ্নিহোত্রী, অনিতা : ‘আমার কথা’, ‘মহানদী’, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৯
৪. অগ্নিহোত্রী, অনিতা : ‘পূর্ববৃত্ত’, ‘মহানদী’, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১১
৫. অগ্নিহোত্রী, অনিতা : ‘মহানদী’, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৪
৬. ঐ, পৃ. ২৭
৭. ঐ, পৃ. ৬০
৮. ঐ, পৃ. ৪৪
৯. ঐ, পৃ. ১৬৮
১০. ঐ, পৃ. ১৬৯